বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রান্তিক জনগণ

মো. শামসুদ্দোহা

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ স্টাডিজের পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ওপর কিছু ডকুমেন্টারি দেখানো হয়, যেখানে ১৯৭১ সালে ভারতের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশের অসহায় মানুষের যাপিত জীবনের করুণ চালচিত্র নিয়ে কিছু দৃশ্য রয়েছে। যাতে ফুটে উঠেছে উদ্বাস্তু শিবিরের মানবেতর জীবনের কিছু খণ্ডচিত্র। একটি ছোট আকারের পাইপ বা টানেলের মধ্যে যে গোটা পরিবার বসবাস করতে পারে তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আশ্রয়দানকারী দেশ ভারতের হয়তো আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল না, কিন্তু প্রায় এক কোটি মানুষের কয়েক মাসের ভার বহন করা সহজ ব্যাপার নয়। তাই উদ্বাস্তু শিবিরে অধিকাংশ মানুষকেই অনাহারে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। এ করুণ দৃশ্য দেখার পর পর্দার মৃদু আলোর ফাঁকে লক্ষ করলাম, আমার ছাত্রছাত্রীদের অনেকের চোখের কোণেই চাপা কষ্ট এসে ভিড় করেছে জলোচ্ছলে। ডকুমেন্টরিটি একদণ্ড থামিয়ে উন্মুক্ত আলোচনায় ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমরা কি উদ্বাস্তু শিবিরের এই দুঃসহ জীবনযাপনকারী মানুষগুলোকে মুক্তিযোদ্ধা মনে কর? মুক্তিযুদ্ধে যে অগণিত নারী ধর্ষণের স্বীকার হয়েছেন কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের আহারের জোগান দিয়েছেন অথবা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা মনে কর?' উত্তরে জেনেছিলাম, তারা সবাই এদের মুক্তিযোদ্ধা মনে করে।

পুরো ডকুমেন্টরি শেষ হওয়ার পর যখন প্রশ্ন, মতামত কিংবা অনুভূতি প্রকাশ করতে বললাম তখন এক ছাত্র জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, মুক্তিযুদ্ধকে যখন আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তখন আমরা এভাবেই দেখি, কিন্তু বলিউডের মুভি 'গুণ্ডে' কিংবা অধিকাংশ চলচ্চিত্র ও বইয়ে এ যুদ্ধকে বিভ্রান্তিকরভাবে কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাক-ভারত যুদ্ধ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। পাকিস্তান, আমেরিকাসহ বেশকিছু দেশ এটিকে দেখানোর চেষ্টা করেছে গৃহযুদ্ধ হিসেবে, এমনকি দেশের ভেতরকারই এক মহল এটিকে দেখাতে চেয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কিংবা তথাকথিত গণ্ডগোল হিসেবে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের অধিকাংশ লেখকই সশস্ত্র যুদ্ধকেই একমাত্র মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হিসেবে আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে সাধারণ প্রান্তিক মানুষের অবদান নিয়ে তেমন বিস্তর আলোচনা আমরা কোথাও পাই না। এক্ষেত্রে অনেক সময়ই মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হই।' সেই ছাত্রের উত্থাপিত বিষয়টি আমার কাছেও অবান্তর মনে হয়নি। কারণ সত্যিকার অর্থেই মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের ভূমিকা নিয়ে বেশকিছু গবেষণা হলেও তা যথেষ্ট নয়। প্রায় সাত কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস নিতান্তই কম হওয়ার কথা নয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের বুকে সগর্বে উচ্চারিত হয় একটি নতুন নাম, মাথা তুলে দাঁড়ায় এক স্বাধীন ভূখণ্ড, যার নাম বাংলাদেশ। দেশটির জন্ম হয়েছিল দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে সশস্ত্র সংগ্রাম বলতে শুধু সশস্ত্র বাহিনীর সংগ্রাম মনে হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার ও আত্মাহুতি দেয়ার বিরল উপাখ্যান, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সর্বজনীন গণমানুষের যুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এমনকি যারা অস্ত্র হাতে তুলে নিতে পারেননি, তারাও দেশের ক্রান্তিলগ্নে সাহায্য করেছেন বিভিন্নভাবে। তাদের হয়তো কোনো পুরস্কারের দরকার নেই, দরকার নেই কোনো মুক্তিযুদ্ধের সনদপত্রের; কিন্তু দেশের প্রতি তাদের রয়েছে অকৃত্রিম ভালোবাসা। এর অর্থ কোনোভাবেই নিয়মিত বাহিনীর সশস্ত্র যুদ্ধকে ছোট করে দেখা নয়, বরং তাদের প্রয়াসকে সাধারণ প্রান্তিক জনগণ কীভাবে গণমানুষের সংগ্রামে রূপদান করেছিল, তারই অনুসন্ধান মাত্র।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ বিজয় এনে দিয়ে যে কোটি কোটি বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের একটি যৌক্তিক দাঁড় করাল, তাদের অবদান আমরা কীভাবে অস্বীকার করব? যে এক কোটি মানুষ বাড়িঘর সবকিছু ছেড়ে ভারতে মানবেতর জীবন কাটাল কিংবা অনাহারে প্রাণ দিল, তাদের অবদানকে আমরা কীভাবে অস্বীকার করব? যে শিশুটি ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করল, তার প্রতিদান আমরা কী দিয়ে দেব? হয়তো সম্মুখ সমরে তাদের উপস্থিতি ছিল না, কিন্তু এ যুদ্ধে কিছু পথভ্রষ্ট বিরোধী ছাড়া গোটা বাংলাদেশের জনগণই মুক্তির ডাকে সাড়া দিয়েছিল। সেসব জীবনযোদ্ধার একাত্তরের কোনো চিঠি নেই, ছিল না কাগজ-কালি, ছিল শুধু দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার অনন্য ব্রত; যা তাকে কয়েক মাসে করে তুলেছিল নিরক্ষর স্বশিক্ষিত যোদ্ধা। তাদের জন্য কোনো স্বীকৃতির দরকার নেই, শুধু দরকার নতুন প্রজন্মের জন্য তাদের অবদানটুকু ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখা।

ইতিহাসের পাতায় একটু পেছন ফিরে তাকালেই দেখা যায়, সুবিধাভোগী উচ্চবিত্তের লোকেরা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে আন্দোলনে সহজে নামতে চায় না। যেমন— তেভাগা কিংবা নীল চাষ-বিরোধী আন্দোলন এলিট ক্লাস করেনি, বরং এলিট ক্লাস জমিদারদের বিরুদ্ধে এগুলো ছিল সাধারণ কৃষকের সম্মিলিত প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। আরেকটু পিছিয়ে গেলে দেখা যায়, ব্রিটিশবিরোধী সিপাহী আন্দোলনে অধিকাংশ সুবিধাভোগী জমিদারই ব্রিটিশদের পক্ষাবলম্বন করেছে। এটাই চিরসত্য। সুবিধাভোগীরা সংগ্রাম করে না, করে বঞ্চিতরা। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান কিংবা '৭১-এর ৭ মার্চের ভাষণে ঝাঁপিয়ে পড়া সমবেত লাখো জনতার শতকরা কয় ভাগ কৃষক শ্রমিকের বাইরে, তা সহজেই অনুমেয়। কিংবা একাত্তরের যুদ্ধে অংশ নেয়া মানুষের খুব কমই ছিলেন, যারা উচ্চবিত্তের। এ যুদ্ধে তারাই অংশ নিয়েছিলেন, যারা পাকিস্তানিদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এটি ছিল তাদের নিজেদের ভাগ্য বদলানোর যুদ্ধ। সুতরাং সাধারণ মানুষ নিজেদের পরাধীনতার গ্লানি ঘুচাতে এবং অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ করতেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, যা এ যুদ্ধকে অনন্য গণযুদ্ধে রূপ দেয়।

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত বিজয় মেলায় বিআইডিএসের গবেষকরা সমবেত ১৫৯ মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সে সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ওই ১৫৯ মুক্তিযোদ্ধার ৭৮ শতাংশই ছিলেন গ্রামের বাসিন্দা। এ থেকেও বোঝা যায়, মুক্তিযুদ্ধে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের ভূমিকা কতখানি। মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা ও অবদানের বিষয়টি মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভূঁইয়া রচিত 'জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা', মাহবুবুল আলম রচিত 'গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে' এবং মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহম্মদের 'রক্তে ভেজা একাত্তর'-এ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার বইয়ে ফুটে উঠেছে কুমিল্লার নৌকার মাঝি মোকসেদ (পৃ-৮৭)-সহ অনেক নাম না জানা সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধের বীরত্বগাথা, যাদের অধিকাংশই সম্মুখ সমরে অংশ না নিয়েও মুক্তির পথকে মসৃণ করেছেন বিভিন্নভাবে। কেউ নৌকা পারাপার করে, কেউ হাইডআউট করে, কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, কেউ তথ্য দিয়ে কিংবা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তথ্য গোপন করে অথবা কেউ অস্ত্রের বোঝা বহন করে। যাদের সবাই মুক্তিযোদ্ধা। দেশমাতৃকার সম্মান বাঁচাতে যে নারী নিজের সম্ভ্রম বিলিয়ে দিয়েছেন পাক হানাদার বাহিনীর হাতে, তার মুক্তিযুদ্ধকে ছোট করে দেখব আমরা কোন সাহসে? সালদা নদীর পাড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পানি পান করাতে গিয়ে পাক বাহিনীর গুলিতে যে রমণী প্রাণ বিসর্জন দিলেন, তার অবদানকে আমরা কীভাবে ছোট করে দেখতে পারি? রিফিউজি ক্যাম্পের সেন্টিমেন্ট ও গণহত্যার চিত্র যেভাবে বাংলাদেশের সপক্ষে বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি তৈরি করেছিল, তা সত্যিই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যেসব দেশে কোনো দিনই হয়তো এ রকম জেনোসাইড কিংবা গণহত্যা হয়নি, তাদের দেশে জেনোসাইড স্টাডিজ নামে কোর্স এবং কোনো কোনো দেশে স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট থাকলেও আমাদের দেশে কোনো কোর্স পর্যন্ত নেই। জেনোসাইড স্টাডিজের কথা না হয় বাদই দিলাম, বাংলাদেশ স্টাডিজ কোর্সটিই আমাদের দেশে খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে; থাকলেও সেটি হয়তো পড়ানো হয় সবচেয়ে নিগৃহীতভাবে সাবসিডিয়ারি কোর্স হিসেবে, কখনো কখনো বিবিএ কিংবা ম্যাথমেটিক্সের শিক্ষক দিয়ে। যদিও আমাদের ব্র্যাকের মতো কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্সটি প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক। এমনকি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্সটি অধ্যয়ন না করলে কোনো সার্টিফিকেটই দেয়া হয় না। এক্ষেত্রে সরকারের একটা ইতিবাচক পদক্ষেপের কথা না বললেই নয়, যেটি হলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিভাগে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস বাধ্যতামূলক করা। তবে এই নতুনভাবে যোগ হওয়া কোর্স ও লক্ষাধিক ছাত্রের জন্য ইতিহাসের শিক্ষক সংখ্যা কিন্তু আগের মতোই রয়েছে। সুতরাং লক্ষ রাখতে হবে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসও যেন অঙ্কের শিক্ষক দিয়ে পড়িয়ে দায়সারা কোর্সে পরিণত করা না হয়।

পড়াতে গিয়ে দেখেছি, তাদের অনেকের মাঝেই জানার প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে কিন্তু অভাব রয়েছে সুযোগের। হয়তো অনেকেই বলতে পারেন জানার ইচ্ছে থাকলেই জানা যায়! হ্যাঁ, আমিও স্বীকার করছি; কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো হাট্টিমাটিম টিমের মতো অর্থহীন জিনিসগুলো কি আমরা সাগ্রহে শিখেছিলাম? খুব সম্ভবত 'না', বরং আমাদের শেখানো হয়েছিল। সুতরাং নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদেরই। নতুন প্রজন্মের কাছে সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি গণমানুষের যুদ্ধের ইতিহাস ও বাংলাদেশের আপামর জনগণের সম্পৃক্ততার ইতিহাস তুলে ধরা না গেলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। কারণ আজ থেকে ৫০ বছর পর কোনো মুক্তিযোদ্ধা জীবিত নাও থাকতে পারেন। সুতরাং এখনই সময় মুক্তিযুদ্ধের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু ইতিহাস হিসেবে সংরক্ষণ করার এবং নতুন প্রজন্মকে জানার সুযোগ করে দেয়ার।

লেখক: শিক্ষক ও কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ স্টাডিজ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
shamsuddoha@bracu.ac.bd